SABITA
A Journal of Humanities

Journal Homepage: www.sabitajournal.com

Article

বঠুখাম্মা : ফুলের উৎসব

ড. অদিতি ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, বারাসত রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়
Email - aditi75729@gmail.com

Keywords:
Bathukamma, Floral, Festival, Telengana.

ABSTRACT

সারসংক্ষেপঃ তেলেঙ্গনাপ্রদেশের ফুলের উৎসব বঠুখাম্মা।এই উৎসব তেলেঙ্গনাপ্রদেশের অন্যতম প্রধান উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরে যেমন রয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তেমনি সামাজিক এমনকি পরিবেশগত দিক দিয়ে বিচার করলে এই উৎসবের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিভাবে তেলেঙ্গনাপ্রদেশের মানুষের সংস্কৃতির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে এই উৎসব সেটিই এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

Bathukamma is the floral festival of Telengana. It is also a state festival of Telengana. This festival represents the cultural spirit of the state. The beautiful floral festival which is celebrated with different colored flower has historical as well as socio-political importance.

CC BY NC

ভূমিকাঃ উৎসব যেকোনো দেশের সমাজের জনমানসের সাংস্কৃতিক মনকে প্রকাশ করে। উৎসব কখনো বিশেষ জাতি বা ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, চরিত্র অথবা রীতিনীতির প্রকাশক হয়, কখনো আবার কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগণের কৃষিকাজ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ঋতুভিত্তিক উৎসবের সূচনা হয়। উৎসবের একসাথে অনেক তাৎপর্য আছে। সামাজিক প্রয়োজনীয়তা তো অস্বীকার করাই যায় না। উৎসব মানুষকে একত্রিত করে। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানুষ উৎসবে মিলিত হয়, আনন্দে মাতে, দৈনন্দিন দিনযাপনের গ্লানি দূরে যায়। বৈচিত্র্য আসে। ভারতবর্ষ নানা ভাষা ধর্ম বর্ণের দেশ। সেখানে যেমন বসবাসকারী মানুষজনের বেশভূষা আহারাদি আচার ব্যবহারের বৈচিত্র্য রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে উৎসবেরও বৈচিত্র্য। এক একটা উৎসব এক একটা জাতি বা এলাকার মানুষজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়কও বটে।

কোন অঞ্চলের অনুষ্ঠানঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণে রয়েছে হায়দ্রাবাদরাজ্য এবং তেলেঙ্গনা প্রদেশ। স্বাধীন ভারতবর্ষে ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৬ সাল অবধি তেলেঙ্গনাপ্রদেশ হায়দ্রাবাদেরই অংশ ছিল যা কিনা নিজামের দ্বারা শাসিত ছিল। এরপর তৈরী হল অন্ধ্রপ্রদেশরাজ্য যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল এই তেলেঙ্গনা এবং হায়দ্রাবাদ অঞ্চল। ২০১৪ সালের ২রা জুন অনেক রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ হয় আজকের তেলেঙ্গনা রাজ্যের। এই এলাকার বাসিন্দারা অধিকাংশই হিন্দু। কিছু রয়েছে মুসলমান। তবে হায়দ্রাবাদে মুসলিমজনজাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তেলেঙ্গনা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একচতুর্থাংশ হল সেইসমস্ত মানুষ যারা পূর্বে অন্ত্যজ বলে অভিহিত হত এবং তপশিলী উপজাতি

শ্রেণীভুক্ত। এছাড়াও রয়েছে লম্বাডীভাষী যাযাবরেরা। মূলতঃ এই তেলেঙ্গনা এলাকার অধিবাসীদের অনুষ্ঠান ছিল বঠুখাম্মা। তেলেঙ্গনাপ্রদেশ ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে এবং অন্ধ্রের ছত্তিশগড় সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও এই অনুষ্ঠান হয়।

ইতিহাস ও লোককথাঃ আজকের তেলেঙ্গনাপ্রদেশ যেখানে সেখানে খ্রীষ্টিয় ৯৭৩ অব্দ অবধি শাসন করত বেমুলাবাড়া চালুক্যরা। এরা ছিল রাষ্ট্রকূট রাজাদের সামন্তরাজা। চালুক্যদের এই ধারাটি নিজেদের সূর্যবংশের উত্তরসূরী বলে পরিচয় দিত, যদিও চালুক্যদের অন্যধারাগুলো চন্দ্রবংশের উত্তরসূরী বলে জনশ্রুতি আছে। বেমুলাবাড়া অঞ্চলে চালুক্যদের রাজত্বকালে রাজা রাজেশ্বরের মন্দির অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। রাজ রাজেশ্বরের মন্দিরের যদিও আজও প্রসিদ্ধি রয়েছে।এদিকে চোল আর রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে বরাবরের বিবাদ ছিল। রাষ্ট্রকূটরাজাদের সঙ্গ দিত চালুক্যরাজারা। চোলরাজা পরান্তকসুন্দর চোল একবার রাষ্ট্রকূটদের আক্রমণের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে পরামর্শ দেন যদি রাজা রাজ রাজেশ্বরের আরাধনা করেন তবে এই আশংকা এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। সুন্দরচোল রাজ রাজেশ্বর মহাদেবের ভক্ত হয়ে তাঁর আরাধনা শুরু করেন। তিনি নিজের পুত্রের নামকরণ করেন রাজ রাজ চোল। এই রাজ রাজ চোলের পুত্র ছিলেন রাজেন্দ্র চোল। সেটা সম্ভবত ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। রাজেন্দ্র চোল তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে চালুক্যরাজা সত্যাশ্রয়কে আক্রমণ করেন এবং পরাস্ত করেন। জয়ের চিহ্ন হিসেবে তিনি রাজ রাজেশ্বরের মন্দির ধ্বংস করেন এবং সেই মন্দিরের মস্ত শিবলিঙ্গটি বহন করে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসেন এবং পিতাকে উপহারস্বরূপ দান করেন। রাজ রাজ চোল একটি মন্দির নির্মাণ করে সেই মন্দিরে এই বৃহদাকার শিবলিঙ্গকে প্রতিষ্ঠা করেন। বৃহদেশ্বর মন্দির আজো রয়েছে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর অঞ্চলে। পরবর্তীতে রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে শিবলিঙ্গকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। লোকমুখে একথা শোনা যায় যে, রাজরাজেশ্বরের মন্দির থেকে শিবলিঙ্গকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়ার পর ঐ মন্দিরের পার্বতীমাতা বা বৃহদাম্মা একলা হয়ে পড়েন। মন্দিরের সেই জাঁকজমক নষ্ট হয়ে যায়। রাজ রাজেশ্বরের অভাবে এলাকাবাসীও মনোকষ্টে ভুগতে থাকতে। সেই সময় থেকে ফুল দিয়ে পাহাড়চুড়োর মতো আকৃতির বঠুখাম্মা তৈরী করে প্রকৃতিমাতার পুজো শুরু হয়।স্থানীয় মানুষ যাদের জীবন রাজ রাজেশ্বরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো তাদের মনোকষ্টে সামান্য হলেও প্রলেপ পড়ে।

খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকে কাকতীয় রাজবংশ রাজত্ব করত দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। তাদের রাজধানী ছিল ওরাগুলু অর্থাৎ আজকের ওয়ারাঙ্গাল। এই এলাকাটা আজকের তেলেঙ্গনা প্রদেশেই অবস্থিত। এই বংশের রাজত্বকালে মানুষজন জলাশয়কে পরিবারের একজন সদস্যের মতই গুরুত্ব দিত। প্রতিটি গ্রামে অন্ততঃ একটি করে জলাশয় রাখা হতই পানীয় জলের জন্য বা অন্যান্য প্রয়োজনে। এমনকি যদি কোনো গ্রামে হ্রদ না থাকতো তবে সেই গ্রামের ছেলের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারতেন না অন্যগ্রামের মানুষজন। তারা মনে করতো জলাশয় তাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা ফুল দিয়ে পুজো করত জলাশয়ের, প্রতি বছর। কেউ কেউ মনে করেন এই কাকতীয় রাজবংশের শাসনের সময় থেকেই বঠুখাম্মার শুরু। ঐ এলাকার মানুষের সাথে প্রকৃতির যোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মূলতঃ দলিত কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষই এই উৎসব পালন করত। আবার অপর একদলের মতে চোলরাজা ধর্মাঙ্গদের বহু পুত্রের মৃত্যুর পর মা লক্ষ্মীর কৃপায় এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজদম্পতী মেয়ের নাম রাখেন লক্ষ্মী। এই সময় থেকেই এই অঞ্চলে বঠুখাম্মা বা ফুলের উৎসব শুরু হয়। বঠুক অর্থাৎ জীবন, আম্মা অর্থে মাতা। জীবনমাতা অর্থ জীবনদায়িনী মাতা। একথা লোকের মুখে ফেরে যে মাতা সতীই পার্বতীরূপে ফিরে এসেছেন। সেইজন্য এই উদ্‌যাপন। এই উৎসবে যে গানগুলি গাওয়া হয় সেগুলি প্রধানতঃ মাতা পার্বতী অথবা বরলক্ষ্মীকে উদ্দেশ্য করে।যদিও গানের ভাষা প্রকৃতি অঞ্চলভেদে পৃথক পৃথক হয়েছে। এই উৎসব প্রায় ১০০ বছরের পুরোনো। নানান রকমের ফুল দিয়ে একটি পাহাড়ের মতো আকৃতি তৈরী করা হয়। সবার ওপরে হলুদ এবং কুঙ্কুম দিয়ে গৌরাম্মা তৈরী করা হয় যা গৌরীর প্রতীক। বঠুখাম্মা শব্দটি এসেছে বৃহদাম্মা এই শব্দ থেকে।

ইতিহাস ও সামাজিক প্রেক্ষাপটঃ বঠুখাম্মার সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা বলতে আরো কিছু কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। মোঘল শাসনের শেষভাগে আসফ খাঁ নামে এক ব্যক্তি গোটা দক্ষিণ ভারতের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এইসময় মোঘল শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। আর আসফ খাঁ নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে এই নিজামের গোষ্ঠী এসে সবচাইতে বড় সামন্তরাজারূপে হায়দ্রাবাদের কৃষকদের ওপর নানাবিধ শর্তারোপ তথা প্রকারান্তরে শোষণ করা শুরু করে। এরপর আসে ইংরেজরা। কৃষকেরা এদের হাত থেকেও রেহাই পায়নি। নিজাম আর ইংরেজদের এই জোটটা যখন দৃঢ় হল, কৃষকদের ওপর এই শোষণের পরিমাণ গেল আরো বেড়ে। উভয়ে ষড়যন্ত্র করে তেলেগু বা অন্ধ্রজাতীয় কৃষকদের দুইভাগে ভাগ করে নিজামের রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এদিকে তেলেগু বা তেলেঙ্গা কৃষকদের বাস হায়দ্রাবাদের অর্ধেক জুড়ে। এই তেলেঙ্গা কৃষকরা যে এলাকায় থাকত , হাযদ্রাবাদের সেই পূর্ব আংশের নাম তেলেঙ্গনা প্রদেশ। তেলেঙ্গনা প্রদেশের অধিবাসীরা ছিল তেলেগু ভাষী হিন্দু। অন্যদিকে হায়দ্রাবাদের নিজাম অর্থাৎ রাজা হল উর্দুভাষী ও মুসলমান। আয়তনে তেলেঙ্গনা প্রদেশ ইংলণ্ডের থেকেও বড়। আর এই এলাকার সকলেই চাষী। তেলেঙ্গনায় রয়েছে আটটি জেলা- ওয়ারাঙ্গাল, নালগোণ্ডা, মহবুবনগর, হায়দরাবাদ মেদাক, নিজামাবাদ, করিমনগর আর আদিলাবাদ।(তেলেঙ্গনা বিপ্লব, কাফি খাঁ, রাডিক্যাল প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৪-১৫) বর্তমান তেলেঙ্গনায় অবশ্য ৩৩টি জেলা রয়েছে। সে যাইহোক , কৃষকরা ও নিজামদের এই অত্যাচারের জবাবে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে আপসহীন সংগ্রাম শুরু করে। কৃষকদের এই সমবেত সংগ্রাম প্রথমদিকে অরাজনৈতিকভাবে শুরু হলেও পরে কমিউনিস্টরা এসে যোগ দেন তাদের সাথে। নিজামশাহীর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এই সংগ্রাম ভারতের গণসংগ্রামের ইতিহাসেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তেলেঙ্গনার এই কৃষকসংগ্রামে নারীরাও সামিল হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের গঠন হয়। তারও প্রায় ১৫ বছর পর পৃথক তেলেঙ্গনার রাজ্যের জন্য শুরু হয় দাবি, এবং সেই প্রেক্ষিতে সামিল হয় ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র।অবশেষে ২০১৪ সালের ১৪ই জুন তেলেঙ্গনা নমে একটি পৃথক রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

এই অঞ্চল কৃষকপ্রধান। আর বঠুখাম্মা ছিল একান্তভাবেই কৃষকদের উৎসব, পিছিয়ে পড়া মানুষজনের উৎসব। এমন অনেক এলাকা ছিল যেখানে তারা এই উৎসব পালন করত একান্তে, কোন শোরগোল ছাড়াই। উচ্চশ্রেণীর মানুষজন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিত না। অন্ত্যজশ্রেণির মহিলারাই পালন করত এই উৎসব। পৃথক তেলেঙ্গনাপ্রদেশের উদ্ভব অনেক কিছু বদলে দিল।যে উৎসব অন্ত্যজ কৃষকশ্রেণীর মানুষজন একান্তে পালন করতো সেই উৎসব আজ রাজ্যের প্রধান উৎসবের মর্যাদা পেয়েছে।এই উৎসব আজ সর্বজনসাধারণের। অথচ একটা সময় এমনও ছিল, সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষজন এই উৎসবে যোগ দিতেন না।উৎসবের নিয়মকানুন হালহকিকত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ওয়াকিবহাল ছিলেন না তাঁরা। আজ সেই দিন আর নেই। পৃথক তেলেঙ্গনা রাজ্যের উদ্ভবের পর এই উৎসবকে ঘিরে গোটা রাজ্যে নয় দিন ব্যপী বিপুল আয়োজন চলে। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানুষজন এই উৎসবে যোগ দেয়। জনৈক দলিত কবি বঠুখাম্মা উৎসবের এমন উদ্দীপনাকে মেনে নিতে পারেননি। নিজেদের একান্তে প্রকৃতিপূজার এই সার্বজনীকরণের বিপক্ষে গিয়ে কলম ধরেছেন তিনি। তাঁর লেখা কবিতার সারমর্ম, প্রিয় বঠুখাম্মা, আজ তোমার প্রাণ হারিয়ে গেছে ভিড়ের মাঝে। পথের বঠুখাম্মা, আজ তুমি প্রাসাদ আর দুর্গের হয়েছে।'

বঠুখাম্মা উৎসবের মহত্ব : বর্ষাকালের প্রবল বৃষ্টিতে নদীনালা ইত্যাদি জলে পূর্ণ হয়ে যায়। চারদিক জলে থৈ থৈ। এরপরে বর্ষার শেষে আসে এক নতুন পৃথিবী। চারদিকের প্রকৃতি সেজে ওঠে ফুলে ফুলে।বর্ষা ঋতুকে বিদায় জানানোর জন্য বড্ডেমা নামের সাত দিনের উৎসব হয়। এই উৎসবের পরেই শুরু হয় বঠুখাম্মা। শরতের আগমনে যেন প্রকৃতিদেবীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্যই এইসময়ে হয় ফুলের এই উৎসব। এই উৎসবে শরতের নানা ফুল ব্যবহার করা হয়। এই উৎসবের সময় নানা আঞ্চলিক গীত গাওয়া হয়।

এই উৎসব কিভাবে পালন করা হয় : এই উৎসব তেলেঙ্গনাপ্রদেশে ইদানীংকালে রাজ্য উৎসবের মর্যাদা পেয়েছে। তাই স্থানীয় লোকজনের মধ্যে এই উৎসবকে ঘিরে এক প্রবল উন্মাদনা দেখা যায়। বিবাহিতা কন্যা এইসময়ে তার নিজের বাবা মায়ের কাছে ফিরে আসে। এমনও মনে করা হয় , তাদের জীবনে পরিবর্তনের জন্য এই উৎসব। বর্ষার শেষে শরতে প্রকৃতিতে যেমন আসে পরিবর্তন ঠিক তেমন বিবাহিতা কন্যার জীবনে পরিবর্তনের দ্যোতকও এই উৎসব এমনটা বলা যেতে পারে। এককথায় বলা যেতে পারে যে এই উৎসব আয়োজনের পিছনে বহু কারণ একত্রীভূত হয়ে রয়েছে।

এই উৎসবের প্রথম পাঁচদিন মহিলারা নিজের নিজের ঘরের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করেন। খুব ভোরে উঠে নিজের নিজের ঘরের প্রাঙ্গণে রঙ্গোলি অর্থাৎ রঙীন আলপনা দিয়ে সাজান। প্রধানত চালগুঁড়ো দিয়ে এই রঙ্গোলি দেওয়া হয়। বাড়ির পুরুষেরা নানান ধরণের ফুল সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। ফুল আনবার পর সেই ফুল পরতে পরতে রঙবেরঙে সাজানো হয় ,শুধুমাত্র ফুল নয়, পাতাও ব্যবহার করা হয় ,এই সজ্জার জন্য। যে প্লেটের ওপর এটি সাজানো হয় তাকে থম্বলম বলা হয়। বঠুখাম্মা হল একটি লোককলা। মহিলারা বঠুখাম্মা বানানো শুরু করেন দুপুরবেলায়।ভাদ্রমাসের অমাবস্যাতিথিতে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। ন'দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলে। সন্ধ্যাবেলায় মহিলারা একত্রিত হয়ে এই উৎসব পালন করেন। এইসময় ঢোল বাজানো হয়। সকলে নিজের নিজের বঠুখাম্মা নিয়ে একত্রিত হন। সামনে সেই ফুলের বঠুখাম্মা রেখে গোল করে সকলে ঘিরে দাঁড়ান। তারপর শুরু হয় গান। আঞ্চলিক ভাষাতে গাঁথা গানগুলো সকলে একসুরে গেয়ে ওঠেন। মহিলারা নিজের নিজের পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি ইত্যাদি প্রার্থনা করেন। ন'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রত্যেকদিনের এক একটি বিশেষ নাম আছে। এই নামগুলো নৈবেদ্যম বা প্রসাদের নাম অনুসারে রাখা হয়। শেষদিনকে সদ্দুল্লা বঠুখাম্মা নামে অভিহিত করা হয়। শেষদিনে বঠুখাম্মাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

বঠুখাম্মায় যে ফুলগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হল ওষধি। বঠুখাম্মায় কতগুলি স্তর থাকে। সকলের নীচে প্রথম স্তরে ব্যবহার করা হয় ক্যাসিয়া এংগুষ্টিফুলিয়া অর্থাৎ সেনা বা সনায় ফুল। তেলেগু ভাষায় ফুলটির নাম থাঙ্গেড়ু পুলু। এই ফুল হলুদ বা সাদা রঙের হয়।

দ্বিতীয় স্তরে ব্যবহার করা হয় সেলাসিয়া আর্জেন্টিয়া বা গরখা ফুল। তেলেগুভাষায় এই ফুলের নাম গুনুগু পুলু। তৃতীয়স্তরে ব্যবহৃত ফুলের নাম সেলাসিয়া ক্রিস্টাটা যাকে বাংলায় মোরগঝুঁটি ফুল বলা হয়। তেলেগুভাষায় এই ফুলের নাম সিতম্মা জদা পুলু। চতুর্থস্তরে ব্যবহার করা হয় ক্লিটোরিয়া টার্নেটা অর্থাৎ অপরাজিতা ফুল।তেলেগুভাষায় এই ফুলের নাম শঙ্খু পুলু। পঞ্চম স্তরে থাকে সেগুন ফুল যাকে তেলুগু ভাষায় বলে টেকু পুলু।ষষ্ঠস্তরে কুমড়ো ফুল বা জবা ফুল থাকে। তেলেগুভাষায় এই ফুলগুলির নাম যথাক্রমে গুম্মাডি পুলু বা মন্দার পুলু। সবশেষ স্তরে সবার ওপরে থাকে একটিমাত্র পদ্মফুল। বঠুখাম্মা ছোট থেকে বড় বিভিন্ন আকৃতির হয়। আগে শুধুমাত্র বুনো ফুল দিয়েই তৈরী হত এই বঠুখাম্মা। চাষীদের গৃহে মহিলারা এই উৎসবের আয়োজন করতেন। আর বাড়ির পুরুষ বুনো ফুল সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। তারপর সেই ফুলে দিয়ে তৈরী হত বঠুখাম্মা।

কোনো পানীয় জলের ট্যাঙ্কে সাধারণত বঠুখাম্মা বিসর্জন দেওয়া হয়। এতে প্রাকৃতিক উপায়ে জল পরিশোধন হয়। ফুল বিসর্জন দেবার পর পরীক্ষায় দেখা গেছে, সেই জলে ব্যাকটেরিয়া প্রতিশোধক গুণ তৈরী হয়,। এমনিতেও রঙীনফুলে প্রচুর এন্টি অক্সিডেন্ট গুণাবলী থাকে। ফলে তা সহজে জল পরিশোধণ করে। বৈজ্ঞানিকরা ঐ জল নিয়ে বিসর্জনের আগে ও পরে পরীক্ষা করে দেখেছেন, দুটো জলে কতটা তফাত।

এই উৎসব মূলত পিছিয়ে পড়া জনজাতির মানুষের উৎসব। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে অনেক কটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে ধরা

পড়ে আমাদের চোখে। ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে যারা উচ্চবর্ণের তাদের ক্ষেত্রে উৎসব পালনে পুরুষদেরই মুখ্য ভূমিকা থাকে। এইসমস্ত পরিবার অধিকাংশক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক। অন্যদিকে বঠুখাম্মাতে মুখ্য ভূমিকা মহিলাদের। পুরুষ তাদের সাহায্য করেন, এই মাত্র। বঠুখাম্মা মূলত প্রকৃতির পুজা। তাই এখানে কোনো মূর্তি থাকেনা। মাতা পার্বতীর প্রতীক হিসেবে তৈরী করা হয় ফুলের বঠুখাম্মা।

উপসংহারঃ প্রান্তিক এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর দিনযাপনের অঙ্গস্বরূপ একান্তে পালন করা উতসব আর রাজ্যের উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরে বর্তমানে উৎসাহ উন্মাদনার শেষ নেই। ভাদ্রমাসের অমাবস্যা থেকে শুরু করে দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথি অবধি অনুষ্ঠান পালনের শেষে বঠুখাম্মাকে বিসর্জন দেওয়া হয় জলে। অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে সন্ধ্যায় মহিলারা সাজপোশাক করে যে যার বঠুখাম্মা নিয়ে দলে দলে একত্রিত হন। তারপর তাদের মাঝে রেখে তাকে ঘিরে আঞ্চলিকভাষায় গান ও নাচ চলে। বিসর্জনের দিন মহিলাদের সাথে সাথে শোভাযাত্রায় অংশ নেন এলাকাবাসী। আমাদের দুর্গাপুজোর দশমীতিথির মতোই যানবাহনও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, বঠুখাম্মাকে নিয়ে যাওয়া হবে বলে। ফুলের উৎসব আজ রাজ্যের সর্বজনসাধারণের উৎসব, রাজ্যের নিজস্বতার প্রতীক।

গ্রন্থসূচী: (References)

K. Sudheer Kumar, N. Ravindra, S. Seetaram Swamy. Traditional and medicinal secrets of Bathukhamma: The floral festival of Telengana . Journal of Pharmaceutical Advanced Research . 2018. 271-275.

K.S.S. Seshan .Telengana : History and the formation of a new state . Studies in People's History. 2018.

Early History of Andhra Country, K. Gopalachari, University of Madras, 1911.

Bathukamma, The unique festival of flowers in Telengana . Eu. Wikipedia. Org.